অধ্যায় ৭ : লোকবাদ্য

প্রাচীনকালে প্রথম কিভাবে লোকবাদ্য গড়ে উঠেছিল, তা আজ অজানা। আওয়াজ বা শব্দই বাদ্যযন্ত্রের প্রধান কথা । কোন শব্দজাত বস্তুকে সচেতন বা অচেতন পদার্থ দিয়ে বিশেষ প্রকৌশলে স্পর্শ করলে যে ধ্বনি ঝংকৃত হয়, তাই বাদ্য । স্পর্শ কৌশল শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। তখন বিশেষ নির্দিষ্ট রণন এবং সুর সৃষ্টি হয়। সুর সৃষ্টির জন্য তৈরি হয় যন্ত্র। এই যন্ত্রই বাদ্য। এই বাদ্য লোকপ্রযুক্তি নির্ভর। আদিম মানুষ হয়তো হাতের কাছে পেয়েছিলেন মৃত গোরু মহিষের সিং। হয়তো তাতে ফুঁ দিয়েছিলেন। বেজে উঠেছিল বাদ্য। সময়ের সাথে সাথে তাতে সুর সংযোজিত করেছিলেন। আদিম মানুষের সেই শব্দ-সুর সংযোগে তৈরি লোকপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পকলাই লোকবাদ্য। আদিমকালে শিকারলাভের আনন্দে মানুষ নৃত্য করতেন। দলবদ্ধ নৃত্যের মধ্যে বেজে উঠত বাদ্য। শব্দ মানুষের মনকে সক্রিয় করে তোলে। যুদ্ধপূর্ব সময়ে বাদ্য বাজিয়ে সৈনিকের মনকে উত্তেজনায় ভরপুর করে প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলা হত রণবাদ্যের মাধ্যমে। রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রায়বেঁশে পদাতিক সৈনিকদের যুদ্ধ নৃত্য সেই বিশেষ রণবাদ্যের কালকে স্মরণ করায়। ধীরে ধীরে সমাজ শীলিত হয়েছে। দেবদেবীর পরিকল্পনা হয়েছে। মানুষ প্রাণের দেবতাকে পূজার জন্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছে। লোকবাদ্যের নির্মাণ এবং ব্যবহারেও দেববাদ, পুরাণ নির্ভরতা এসেছে। পরিশীলিত শৃঙ্খলিত সমাজে সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করেছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, পূজা-পার্বণ, বার-ব্রত, লোকাচার এবং অনুষ্ঠানে অনুসারী লোকবাদ্যের সৃষ্টি হয়েছে। নানা বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ উপকরণভেদে নানা লোকবাদ্য সৃষ্টি করেছে। জীবনের আনন্দ বিষণ্ণতায় মানুষ গান গেয়েছে। সেই অন্তর্নিহিত সুরের সঙ্গে বাদ্যের শব্দ সঙ্গীতকে বিশেষ মূর্ছনা এনে দিয়েছে। বাংলার লোকসঙ্গীতে এসেছে নানা বিচিত্র লোকবাদ্য। বিভিন্ন ধাতব উপকরণে বিভিন্ন লোকবাদ্য সৃষ্টি হয়। পিতল, কাঁসা, লোহা, কাঠ, বাঁশ, চামড়া, গোরু মহিষের সিং, লাউয়ের শুকনো খোল প্রভৃতি দিয়ে লোকবাদ্য তৈরি হয়। ডোকরা কামারেরা পিতল কাঁসার ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করেন। মুচি চামড়া দিয়ে ঢাক ঢোল প্রস্তুত করতেন। শিল্পীরা শুধু বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে থেমে থাকেন নি, লোকবাদ্যের প্রয়োজনীয়তাকে তারা সৌন্দর্যে ভরপুর করেছেন। নানা মোটিফ প্রতীক এবং চিত্রকলায় লোকবাদ্যের সৃষ্টি সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়েছে। এক এক সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এক এক রকমের বাদ্য বাজাতেন। ঢাকী বাজান

ঢাক, ঢুলি বাজান ঢোল, শিঙ্গাদার সিঙ্গা, বংশীবাদক বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন। রাখাল বালক কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ বংশীবাদক ছিলেন। লোকবাদ্যের নির্মাতা এবং বাদ্যকরেরা সমাজনিষ্ঠ ছিলেন। লোকবাদ্যের স্রষ্টা, রক্ষক এবং বাহক ছিলেন লোকসমাজ। সমাজ সংহতি লোকশিল্প তথা লোকবাদ্যের প্রাণ। লোকবাদ্যের সুর মানুষের আনন্দ বিষাদের সামাজিক চারণভূমি। মানুষ বাদ্যযন্ত্রের শব্দের সঙ্গে সুর করে মন্ত্র বলেছে। ভূত প্রেত তাড়িয়েছে। শঙ্খ বাজিয়ে পুজো করেছে। সমাজের মঙ্গল কামনা করেছে। লোকবাদ্য হয়ে উঠেছে লোকশক্তির প্রতীক। গবেষকেরা লোকবাদ্যকে নানাভাবে শ্রেণীকরণ করেছেন। আজ অনেক লোকবাদ্যই লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীনযুগের চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নানা লোকবাদ্যের উল্লেখ রয়েছে। সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই লোকবাদ্যের বিচিত্র বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাচীন সময়ের লোকবাদ্য বিশেষভাবে সাহিত্যরূপ পেয়েছে। যুদ্ধ-বিবাহ-মঙ্গল অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে মুকুন্দরাম লোকবাদ্যের উপস্থিতি দেখিয়েছেন। নানা বৃত্তিজীবী শিল্পী সম্প্রদায়ের লোকবাদ্য শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন কবি সাধারণ পাঠক সমাজকে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লোকবাদ্য এবং লোকবাদ্যশিল্পীর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অনুসন্ধান এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে নানা বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল। সূত্রধর বা ছুতোর সম্প্রদায়ের শিল্পীরা নানা ধরনের লোকবাদ্য তৈরী করতেন। এছাড়া চর্মকার বা চামারেরাও তৈরী করতেন নানা জাতীয় লোকবাদ্য। সূত্রধর বা ছুতোরেরা বাদ্যযন্ত্রগুলিতে ফুল পাতার নানা চিত্র অঙ্কন করতেন। কোন বাদ্যযন্ত্রে পেখম তোলা ময়ূর, কোনটিতে শুকসারী, কোনটিতে সুরসুন্দরীর মূর্তি অঙ্কন করতেন লোকশিল্পীরা। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের মেলবন্ধন ঘটানো হত বাদ্যযন্ত্রগুলিতে।

কবিকঙ্কণের কাব্যে নানা বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। বাংলার লোকবাদ্যের বিপুল সমাহার কবির কাব্যকে অনন্য করে তুলেছে। লোকবাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অনেক বাদ্যযন্ত্রই চামড়ার তৈরী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত লোকবাদ্যগুলির বৈচিত্র্য চোখে পড়ার মত। কাব্যে যেসব লোকবাদ্য উল্লিখিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডিন্ডিম, খমক, দগড়, দুন্দুভি, ভেরি, দামা (দামামা), কাড়া, জগঝম্প,

ডম্ফ, মন্দিরা, কাঁসর, বীণা, রুদ্রবীণা, ডমরু, বেণু, মৃদঙ্গ, কিঙ্কিণী, শঙ্খ, শিঙ্গা, দড়মসা, ঘণ্টা, জয়ঘণ্টা, জয়শঙ্খ, বেনি, পড়া, গজঘণ্টা, ঢাক (পটহ), ঢোল, রণঘণ্টা, সানি, উরমাল (ঘুঙুর), টমক, কম্ফ, বীরঢাক, মাদল, চৌদল, রায়বেনি, গজবেনি, কংষ, ব্যালিষ, তবল, ঢেমচাঁ, কড়া, পড়া, কাড়া, কাঁসর, বরঙ্গ ভেরি, দোসরি, মোহরি, শৃঙ্গশঙ্খ, করতাল, ডুবা, মলবাঁকি, বানা প্রভৃতি।

বাংলার লোকবাদ্য ঐতিহ্য আশ্রয়ী। এর প্রাণ সমাজের গভীর তলদেশের শেকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অজিত মুখার্জী তাঁর 'Folk art of India' গ্রন্থে লিখেছেন - " India, with a rich cultural heritage, is well known for her deep – rooted folk tradition. To understand how closely it is integrated with life and how expressive it can be of a way of living, Indian folk art offers rich and significant forms, which are some of the deepest satisfactions known to man."[১]

কবিকঙ্কণের কাব্যে উল্লিখিত লোকবাদ্যগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে ——

খমক, আনন্দলহরী : - খমককে গুবগুবি বা আনন্দলহরীও বলা হয়। খমক পুরাতন লোকবাদ্য। পল্লীবাংলার একান্ত চেনা বাদ্যযন্ত্র রূপে এই বাদ্যটি বিশেষ পরিচিত। ভক্তি আশ্রিত লোকসঙ্গীত, বাউল এবং ভাটিয়ালি গানে এই বাদ্য ব্যবহৃত হয়। কাঠের নলের মত বাদ্যযন্ত্র হল খমক। খমকের নিচের দিকে চামড়ার আবরণ থাকে। আবরণের মধ্যভাগে ফুটো করা হয়। সেই ছিদ্রপথে তার যোগ করা থাকে। যেমন ঢোলের দুটি মুখ বন্ধ থাকে, খমকের ক্ষেত্রে তা নয়। খমকের এক মুখ বন্ধ থাকে। খমকের তারে আঘাত করা হয়। এর ফলে খমকে শব্দ হয় এবং সুর উত্থিত হয়। খমকে গুবগুব করে ধ্বন্যাত্মক শব্দ হয়, তাই এর নাম গুবগুবি। বাদ্য বাজার সময় সুর ও ছন্দের দোলা ওঠে। এই দোলা আনন্দময় লহরী। এজন্যই হয়তো এর নাম আনন্দলহরী। বাংলাদেশে নাচের অনুষ্ঠানে এবং কৌতুক নাটকে খমকের ব্যবহার আছে। আবদুল ওয়াহাব তাঁর 'বাংলার লোকবাদ্য' গ্রন্থে লিখেছেন – "আনন্দলহরি ছয় ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত নলাকৃতি কাঠের তৈরী বাদ্য।" [১(ক)]

কবিকঙ্কণের কাব্যে খমকের উল্লেখ এসেছে। আখেটিক খন্ডের 'সরস্বতী বন্দনা' অংশে খমক উল্লিখিত হয়েছে–

“রবাব খমক বেনি   সপ্তস্বরা পিনাকিনী

বীণা বেণু মৃদঙ্গ–বাদিনী”। [২]

সেকালে উৎসব অনুষ্ঠান, পূজা–পার্বণে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে খমক বাজানো হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

“শঙ্খ ঘণ্টা ডম্ফ   খমক জগঝম্প

বাজয়ে ডমুরু বিধান”।[৩]

বাঙালির পূজা–পার্বণ অনুষ্ঠানে পরিবর্তন এসেছে। আনন্দ - উৎসবের ধরন ধারণ বদলেছে। আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাব গ্রাম বাংলার প্রান্তিক স্তরকেও প্রভাবিত করেছে। স্বভাবতই অনিবার্যভাবে হারিয়ে যাচ্ছে মধ্যযুগীয় লোকবাদ্য। লোকবাদ্যের নির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। সেকালের বাউল,ভক্তি আশ্রিত গান এবং ভাটিয়ালি গানেরও সেরকম প্রচলন নেই একালে । এই লোকবাদ্যটিও সময়ের সাথে সাথে একদিন হারিয়ে যাবে অনিবার্য ভাবে।

দগড়, দগাড়, ঢেমচা: - চামড়া দিয়ে তৈরি বাংলাদেশের একটি পুরাতন লোকবাদ্য হল দগড়। দগড় যেন একটি আধখানা বাতাবি লেবু। দগড়ের মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা। দগড়ে দুটি কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাদ্যকার জোরে জোরে শব্দ সৃষ্টি করেন। বিশেষত যুদ্ধের সময় বাদ্যকার হাতির পিঠে এই বাদ্যযন্ত্র রেখে বাদ্য বাজান। এতে যুদ্ধের বীরভাব জাগ্রত হত। একালে এই বাদ্যযন্ত্র প্রায় লুপ্ত। কবিকঙ্কণের কাব্যে দগড়ের উল্লেখ আছে। খুল্লনার বিবাহ উপলক্ষ্যে দগড় বেজে উঠেছিল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

“পটহ মৃদঙ্গ সানি   দগড় কাসর বেনি

শঙ্খ কাজে দোখন্ডি বল্লকী” ।[৪]

আবার সমুদ্র পারের সিংহলে পদাতিক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়েছে। বেজে উঠেছে নানা যুদ্ধবাদ্য। বেজে উঠেছে দগড় দগড়ি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

“দগড় দগড়ি বাত্র শত শত জনা”।[৫]

আখেটিক খণ্ডে ফুল্লরার বিবাহ উপলক্ষ্যেও বেজেছে দগড়ি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"ঢেমচা বাজয়ে পড়া   দ্বিজ বান্ধে গ্রন্থচূড়া

বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী" ।[৬]

আবার ফুল্লরার শ্বশুরালয়ে যাত্রার সময়েও বেজেছে দগড়ি–

"ছায়ামণ্ডপের মাঝে   ঢেমচা দগড়ি বাজে

বন্ধুজন দিলেন জৌতুকে" ।[৭]

মধ্যযুগের লোকায়ত মানুষের আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমগুলির অনেক কিছুই মঙ্গলসূচক। বিবাহ প্রভৃতি শুভ অনুষ্ঠানে দগড় বাজানোর রীতি ছিল। একালে দগড় হারিয়ে গেছে। সেই লোকবাদ্যের স্রষ্টারাও নেই। নেই বাদ্যযন্ত্র বাজানোর বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ও।

দুন্দুভি : - চামড়া দিয়ে তৈরি লোকায়ত বাংলাদেশের পুরাতন লোকবাদ্য হল দুন্দুভি। অতীতে দুন্দুভি নির্মাণ করা হত মাটির হাঁড়ি দিয়ে। পরে পিতল, তামা ও কাঠ দিয়ে এই বাদ্যযন্ত্র তৈরী হত। দুন্দুভির খোলের অংশ তৈরী হত কাঠ দিয়ে। কাঁসার পাতলা পাত থাকত ভেতরে। বাদ্যযন্ত্রটি চামড়া দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। দুন্দুভি বাজানো হত হরিণের শিং দিয়ে। বাজানোর সময় মেঘ ডাকার মতো গুরুগুরু শব্দ সৃষ্টি হয়। সাধারণত যুদ্ধের সময় দুন্দুভি বাজানো হত। এই যুদ্ধ বাদ্যকে 'নাকাড়া'ও বলা হয়। অতীতে মাটিতে গর্ত তৈরী করে প্রাণীর চামড়া দিয়েও এমন দুন্দুভি তৈরী করা হত। এরকম দুন্দুভিকে 'ভূমি-দুন্দুভি'ও বলা হয়। বিশেষত যুদ্ধ এবং বিপদের সতর্কতার জন্য সেকালে দুন্দুভি বাজানো হত। মধ্যযুগে উৎসব অনুষ্ঠানেও দুন্দুভির প্রচলন ছিল। আবদুল ওয়াহাব তাঁর 'বাংলার লোকবাদ্য' গ্রন্থে লিখেছেন – "প্রাচীনকালে ভূমি- দুন্দুভি নামের একটি বাদ্য যন্ত্র মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মুখে পশুর চামড়া দিয়ে আবৃত করে ভূমি দুন্দুভি তৈরী করা হত।" [৭(ক)]

কবিকঙ্কণের কাব্যে দুন্দুভির উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে–

আখেটিক খণ্ডে দুন্দুভির উল্লেখ :

১) দুন্দুভি (পৃঃ ৮৭) ২) দুন্দুভি (পৃঃ৮৯)

বণিক খণ্ডে দুন্দুভির উল্লেখ :

১) দুন্দুভি (পৃঃ১০৪) ২) দুন্দুভি (পৃঃ১২৪) ৩) দুন্দুভি (পৃঃ১২৫)৪) দুন্দুভি (পৃঃ১৯৭) ৫) দুন্দুভি (পৃঃ২১৩) ৬) দুন্দুভি (পৃঃ২২৯)৭) দুন্দুভি (পৃঃ২৪৬) ৮) দুন্দুভি (পৃঃ২৫৬) ৯) দুন্দুভি (পৃঃ২৫৮)১০) দুন্দুভি (পৃঃ২৬৪) ১১) দুন্দুভি (পৃঃ২৬৫) ১২) দুন্দুভি (পৃঃ২৬৯)১৩) দুন্দুভি (পৃঃ২৭১) ১৪) দুন্দুভি (পৃঃ২৭৪) ১৫) দুন্দুভি (পৃঃ৩১০) ১৬) দুন্দুভি (পৃঃ৩০৩)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [৮]

কালকেতুর স্বপ্নের নগরী গুজরাট পত্তনের পর প্রতি সন্ধ্যাকালে দীপ জ্বলে, বাজে দুন্দুভি–

"প্রতিঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে

শঙ্খ ঘন্টা বাজে বীণা বেনি" ।[৯]

এমনি কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েছেন কালকেতু, বেজে উঠেছে দুন্দুভি–

"বাদ্যের নাহী সীমা দুন্দুভি বাজে দামা

ঘন বাজে সিঙ্গা কাড়া"।[১০]

বণিকখণ্ডেও যুদ্ধবাদ্য রূপে দুন্দুভির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"বাজে মহল হৈল ডিঙ্গা ঘন বাজে রণশিঙ্গা

রণভেরি দুন্দুভি নিসান"।[১১]

সিংহলরাজের সঙ্গে যে যুদ্ধের প্রস্তুতি সেখানেও দুন্দুভির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে–

"সমরে দুন্দুভি বেনি রণপড়া বাজে সানি

কোলাহল হইল সুরপুরে"।[১২]

সেকালে মহিষের শিং দিয়ে দুন্দুভি তৈরী করা হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"বিষাণ দুন্দুভি বাদ্য করিআ বাজনা" ।[১৩]

সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যেই দুন্দুভির উল্লেখ আছে। সমাজ মানসে এককালে দুন্দুভি মানুষের রণ উন্মাদনাকে বাড়িয়ে তুলত। সাহিত্যে দুন্দুভির ব্যবহার এসেছে পৌনঃপুনিক ভাবে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্যে দুন্দুভির ব্যবহার এসেছে–

"রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
ভেরি, তূরি, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ !শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর"।[১৪]

ভেরি : - ভেরি প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ ধরনের বাঁশি। মুখে ফুঁ দিয়ে ভেরি বাজানো হয়। ছোট ছোট পিতলের নল যোগ করে পল্লী শিল্পী ভেরি তৈরী করতেন। ভেরির ছোট ছোট অংশকে খুলে রাখা হয়। আবার খণ্ডাংশগুলিকে পরিয়ে বাজানো হয়। পুরাতন যুদ্ধবাদ্য হিসাবে মধ্যযুগের সাহিত্যে ভেরির উল্লেখ অনেক।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ভেরি এসেছে নিম্নলিখিত রূপে–

[নিম্নোক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][১৫]

আখেটিক খণ্ডে ভেরির উল্লেখ: -

১) ভেরি (পৃঃ২০) ২) ভেরি (পৃঃ৮৭)

বণিক খণ্ডে ভেরির উল্লেখ নিম্নরূপ : -

১) ভেরি (পৃঃ১২২) ২) ভেরি (পৃঃ১৭৪) ৩) ভেরি (পৃঃ১৯৭) ৪) ভেরি (পৃঃ২৫৮) ৫) ভেরি (পৃঃ৩০১) ৬) বরঙ্গ ভেরি (পৃঃ২০৭)

আখেটিক খণ্ডে গৌরীর বিবাহ অনুষ্ঠানে ভেরির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে–

"শঙ্খ বেণু বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
বাজনে হইল কোলাহল"।[১৬]

আবার বণিক খণ্ডে যুদ্ধবাদ্য রূপে ভেরির উল্লেখ কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে–

"বাজেমহল হৈল ডিঙ্গা ঘন বাজে রণশিঙ্গা

রণভেরি দুন্দুভি বাজন"।[১৭]

ভেরি ছিদ্রযুক্ত। যাকে বলা হয় শুষির বাদ্য। এই বাদ্যযন্ত্র বায়ু পুরণের মাধ্যমে বাজানো হয়। প্রাচীন সমর বাদ্যরূপে এই লোকবাদ্যকে আখ্যায়িত করা হয়। তরঙ্গ বা তুরঙ্গ নামেও এই লোকবাদ্য লোকসমাজে পরিচিত। আবদুল ওয়াহাব তাঁর "বাংলার লোকবাদ্য" গ্রন্থে ভেরি সম্পর্কে লিখেছেন – "ইচ্ছা করলে অংশক্রমে ভাঁজ করে এটিকে গুছিয়ে রাখা যায়। আবার ভাঁজে ভাঁজে টেনে নলটিকে বেশ লম্বা করে তোলা যায়। বাজাবার সময় নলটিকে টেনে লম্বা করে নেওয়া হয়। প্রাচীন সমরবাদ্য। তুরঙ্গ বা তরঙ্গ নামেও এ যন্ত্রকে আখ্যায়িত করা হয়।"[১৭(ক)]

দামামা , দামা: - দামামা মাটির তৈরী লোকবাদ্য। বাদ্যযন্ত্রটি চামড়ায় ঢাকা। সেকালে সমর বাদ্যরূপে দামামা ব্যবহৃত হত। কবিকঙ্কণের কাব্যে দামামার উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিত রূপে–

আখেটিক খন্ডে উল্লিখিত দামা : -

১) দামা (পৃঃ১৪) ২) দামা (পৃঃ৯১)

বণিক খন্ডে উল্লিখিত দামা : -

১) দামা (পৃঃ১২৪) ২) দামা (পৃঃ২০৭) ৩) দামা (পৃঃ২০৮) ৪) দামা (পৃঃ২১১) ৫) দামা (পৃঃ২৫৬) ৬) দামা (পৃঃ২৬৪) ৭) দামা (পৃঃ২৭১–তিনবার উল্লিখিত) ৮) দামা (পৃঃ২৭২) ৯) দামা (পৃঃ২৭৫) ১০) দামা (পৃঃ২৭৬)

কাব্যে দামামার উল্লেখ নিম্নরূপ : -

১) দামামা (পৃঃ২০৮) ২) দামামা (পৃঃ২৫৩) ৩) দামামা (পৃঃ২৭০) ৪) দামামা (পৃঃ২৭৪)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][১৮]

আখেটিক খণ্ডে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের সময়ে দামামা বেজে উঠেছে –

"দামা দড়মসা বাজে ব্যালিস বাজনা"।[১৯]

কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধে বেজে উঠেছে দামামা।

"চৌদিকে ধাঁধাঁ বাজায় দামা

তবকী তবকে রোল"।[২০]

বণিক খণ্ডে খুল্লনার বিবাহ উপলক্ষ্যে দামা বেজে উঠেছে –

"কেহ গায় গীত নাট কায়বার পড়ে ভাট

করিবর-পিঠে বাজে দামা"।[২১]

সিংহল নগরে বণিক ধনপতি দত্তের সঙ্গে যুদ্ধে বেজেছে দামামা –

"ঘন বাজে দামা চমকিত সর্বজনা"।[২২]

আবার ধনপতি দত্ত সমুদ্র উপকূলে রত্নমালার ঘাটে বাজিয়েছেন দামামা -

"রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি"।[২৩]

কিংবা–

"প্রবেশিআ রাজপুরে কেন বাজায় দামা"।[২৪]

কমলে কামিনীর কথা শুনে রাজা নানা বাদ্য বাজানোর পরামর্শ দিয়েছেন। বেজে উঠেছে দামা–

"গজ পিঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা"।[২৫]

ধনপতির দুর্দশায় দেবীর ক্ষোভ,আবার বেজে উঠেছে দামামা–

"কালো ধলো কেহ রাঙ্গা দামা ঘন্ডা বাজায় সিঙ্গা"।[২৬]

সিংহল প্রান্তরে আবার বেজেছে দামা–

"সাজ সাজ বলিআ দামায় পড়ে ঘা"।[২৭]

কিংবা–

"হাতে দামা কাড়া ঢোল তবল নিসান"।[২৮]

সমর পলাতক সিংহল বাহিনী, যুদ্ধজয়ী ধনপতি বেজেছে দামা–

"সমরে ভুগিনিগণ ছাড়ে সিংহনাদ"। [২৯]

আবার প্রেতের হাটেও বাজে দামা–

"জোড়া দামা বাজে কালি বাজনা বাজায় ঢুলি"।[৩০]

দেখা যাচ্ছে, কাব্যে দক্ষযজ্ঞে, বিবাহে, যুদ্ধে এমনকি প্রেতের হাটেও দামামা বেজেছে। এমন লোকবাদ্যের প্রচলন একালে আর নেই।

<u>**কাড়া**</u> **:** - কাড়া মাটি দিয়ে তৈরী নারকেল মালার মত সেকালের পল্লীবাংলার গুরুত্বপূর্ণ বাদ্য। পরবর্তীকালে কাঠ এবং পিতল কাঁসা দিয়েও এই লোকবাদ্যটি তৈরী হয়েছে। কাড়ার খোলা মুখের অংশ চামড়া দিয়ে ঢাকা।বাদ্যযন্ত্রটি মাটিতে বসিয়ে বা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে কাঠির সাহায্যে বাদ্যকার বাজাতেন। যুদ্ধবাদ্য রূপে কাড়ার পরিচিতি। এছাড়া হিন্দুদের সামাজিক এবং মাঙ্গলিক ক্রিয়া-কর্মে কাড়া বাজানো হত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কাড়ার ব্যবহার অনেক। কবিকঙ্কণের কাব্যে কাড়া এসেছে সুদূর সিংহলে দেবীর ক্ষোভে ধনপতি উদ্ধারে যুদ্ধবাদ্য রূপে–

"কালো ধলো কেহ রাঙ্গা দামা ঘন্ডা বাজায় সিঙ্গা

কাড়া পড়া বাজায় বাজন"।[৩১]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাড়া উল্লিখিত হয়েছে নিম্নলিখিত রূপে–

১) কাড়া (পৃঃ১৫৩) ২) কাড়া (পৃঃ২০৭) ৩) কাড়া (পৃঃ২১১) ৪) কাড়া (পৃঃ২৩১) ৫) কাড়া (পৃঃ২৫২) ৬) কাড়া (পৃঃ২৭১) ৭) কাড়া (পৃঃ৩০১)।

[নিম্নোক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][৩২]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ এসেছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক সন্তানেরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। তাই আনন্দ উৎসবে বেজেছে বিভিন্ন বাদ্য। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন– "রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল। [.............] এতক্ষণ বৈষ্ণবদিগের রণবাদ্য অধিক ছিল না, কিন্ত সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়া নাগারা, ঢাক ঢোল, কাঁসি সানাই, তুরি, ভেরী, রামশিঙ্গা, দামামা আসিয়া জুটিল। জয়সূচক বাদ্যে কানন প্রান্তর নদীসকল শব্দ ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল"। [৩৩]

জগঝম্প: - জগঝম্প মাটির তৈরী লোকবাদ্য। অনেকটা কাড়ার মত। তবে জগঝম্প কাড়ার থেকে একটু বেশি বড়। জগঝম্প মাটিতে রেখে বা গলায় ঝুলিয়ে বাজানো হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যের আখেটিক খন্ডে জগঝম্পের উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে–

১) জগঝম্প (পৃঃ৩০) ২) জগঝম্প (পৃঃ৯১)

বণিক খন্ডে জগঝম্পের উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে–

১) জগঝম্প (পৃঃ১২২) ২) জগঝম্প (পৃঃ১২৫) ৩) জগঝম্প (পৃঃ২০৭) ৪) জগঝম্প (পৃঃ২৯৯) ৫) জগঝম্প (পৃঃ৩০৪)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][৩৪]

খুল্লনার বিবাহে জগঝম্প বেজেছে সারি সারি–

"টমক খমক ভেরি   জগঝম্প সারি সারি

অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নৃত্তকী"।[৩৫]

বিবাহ উৎসব, সাধু ধনপতি দত্তের পাশে বসে আছেন খুল্লনা, বেজেছে জগঝম্প–

"টমক খমক সানি বাজে জগঝম্প"।[৩৬]

সিংহল নগরে যুদ্ধের ঘনঘটা। ঘন বাজে জগঝম্প –

"ডিণ্ডিম ডম্বুর   পুরএ অম্বর

ঘন বাজে জয় জগঝম্ফ"।[৩৭]

শ্রীমন্ত সিংহল কারাগার থেকে পিতা ধনপতি দত্তকে উদ্ধার করেছেন। পুত্রবধূসহ ধনপতি দত্ত ফিরছেন। মঙ্গল বাদ্য জগঝম্প বেজে চলেছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"বাজএ মঙ্গল-পড়া   জগঝম্প সানি জোড়া

আগে পিছে বাজএ বাজন"।[৩৮]

শ্রীমন্ত এবং সিংহল রাজকন্যার বিবাহ। মাথায় মুকুট মউড় দিয়ে দম্পতি বসেছেন। স্বদেশে ফেরার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন শ্রীমন্ত। সর্বত্র সুবাতাস, মঙ্গলধ্বনি, কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"টমক খমক বেনী বাজে জগঝম্প"।[৩৯]

আখেটিক খন্ডে দেবী পূজায় জগঝম্প বেজে উঠেছে–

"শঙ্খ ঘন্টা ডম্ফ খমক জগঝম্প

বাজয়ে ডুমুর বিধান"।[৪০]

কলিঙ্গরাজের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধে বেজে উঠেছে জগঝম্প–

"ডিণ্ডিম ডম্বর পুরএ অম্বর

ঘন বাজে জগঝম্প"।[৪১]

ডমরু এবং জগঝম্প যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধে বেজেছে এমন যুদ্ধবাদ্য।

ডম্ফ : - ডম্ফ অনেকটা চালুনীর সদৃশ কিন্তু ছিদ্র বিহীন লোকবাদ্য। কাঁসা বা পিতলের ছোট ছোট চাকতি দিয়ে তৈরী। চাকতিগুলি গোলাকার কাঠের পাতলা বৃত্ত সদৃশ, দৃঢ়বদ্ধ ভাবে আবদ্ধ থাকে। সাধারণত অনেকের সম্মিলিত নৃত্যে ডম্ফ বাজানো হয়। বাজানোর সময় ধাতব অনুরণন হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে ডম্ফের উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে-

আখেটিক খণ্ডে ডম্ফের উল্লেখ: -

১) ডম্ফ (পৃঃ৩০) ২) ডম্ফ (পৃঃ৩৫)

বণিক খণ্ডে ডম্ফের উল্লেখ : -

১) ডম্ফ (পৃঃ২০৭) ২) ডম্ফ (পৃঃ২১১)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][৪২]

আখেটিক খণ্ডে পূজা উৎসবে বেজেছে ডম্ফ। দেবী হৈমবতীর পূজায় ডম্ফ বেজে উঠেছে -

"শঙ্খ ঘণ্টা ডম্ফ খমক জগঝম্প

বাজয়ে ডমুরু বিধান"।[৪৩]

এমনি শিব পূজায় বেজেছে ডম্ফ–

"প্রথমপতি কাছে ত্রিদশ পতি নাচে

ডম্ফ বাজে তাধিংধিঙ্গা"।[৪৪]

সিংহল রাজসভায় আনন্দ উৎসব, বেজেছে ডম্ফ–

"রবাব মরুজ ডম্ফ করএ বাজন"।[৪৫]

সিংহল সমুদ্রে কমলে কামিনী। আনন্দে আত্মহারা সিংহলবাসী–

"ডম্ফ মোহরি বাজে বীরকালি তাহে সাজে

নানা বাদ্য বাজএ বিশাল"।[৪৬]

সেকালে রাজার কোনো শুভ ঘোষণায় প্রজারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন। তারা রাজ্যব্যাপী সমবেত ভাবে বাদ্যযন্ত্র সহকারে নৃত্য করতেন। কবিকঙ্কণ তাঁর সমকালের একটি যুগচিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মন্দিরা : - মন্দিরা কাঁসা নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। মন্দিরা দুটি ছোট বাটির মতো তাল নির্ভর বাদ্য। বাটি দুটির মধ্যস্থলে ছিদ্র করে দড়ি দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। হাত দিয়ে বাটি দুটিকে পর্যায়ক্রমে আঘাত করে শব্দ সৃষ্টি করা হয়। মন্দিরায় তাল জ্ঞানকে বিশেষভাবে মান্যতা দেওয়া হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে মন্দিরার উল্লেখ এসেছে। আব্দুল ওয়াহাব তাঁর 'বাংলার লোকবাদ্য' গ্রন্থে লিখেছেন --- "কীর্তন ও বাউল অঙ্গে রচিত কাব্য-গীতিতে মন্দিরা বাজানো হয়।" [৪৬(ক)]

আখেটিক খণ্ডে কালকেতু শিকারে চলেছেন। যাত্রাপথে সংস্কারে মঙ্গল চিহ্ন ফুটে উঠেছে। দেখেছেন দক্ষিণে গণিকা, ব্রাহ্মণ এবং পদ্মফুল। বামে শৃগাল এবং জলপূর্ণ ঘট। পল্লীতে পল্লীতে বেজেছে মৃদঙ্গ মন্দিরা –

"মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় কেহো নাচে কেহো গায়

শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি"।[৪৭]

বণিক খণ্ডে স্বর্গ নর্তকী রত্নমালা নৃত্য করছেন। নৃত্যের তালে তালে বেজেছে মন্দিরা –

"তাতিনি তাতিনি তিনি মৃদঙ্গ মন্দিরাধ্বনি

ঘন বাজে কিঙ্কিণী কঙ্কণ"।[৪৮]

দেখা যাচ্ছে, স্বর্গ নর্তকী রত্নমালার নৃত্য গীতে বেজেছে মন্দিরা। নৃত্যগীতে পরিশীলিত আর্য সংস্কৃতির এক প্রাচীন পটভূমিকে কবিকঙ্কণ পাঠকের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন। তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী কবি মুকুন্দরাম সেকালের নৃত্য কলায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের তথ্যনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

কাঁসর : - কাঁসার তৈরী বিশেষ ধরনের বাদ্যযন্ত্র হল কাঁসর। কাঁসরের ওপরের দিকে ফুটো দিয়ে দড়ি বাঁধা থাকে। বাদক সেই দড়িতে হাত দিয়ে মোটা কাঠি ধরে কাঁসর বাজান। সাধারণত পূজা পার্বণে এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কাঁসর বাজানো হয়। ঢোকরা শিল্পীরা কাঁসর তৈরী করেন।

কবিকঙ্কণের কাব্যে কাঁসর এসেছে নিম্নরূপে–

আখেটিক খণ্ড : -

১) কাঁসর (পৃঃ৮৭)

বণিক খণ্ড : -

১) কাঁসর (পৃঃ১২২) ২) কাঁসর (পৃঃ১৭৪)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][৪৯]

আখেটিক খন্ডে দেখা যাচ্ছে, কালকেতুর স্বপ্নের নগরী গুজরাট মথুরার স্মৃতি জড়ানো। হরিনাম সংকীর্তনে বৈষ্ণবীয় প্রভাব স্পষ্ট। প্রতিসন্ধ্যায় দীপ জ্বলে। বাজে কাঁসর–

"প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে   কাঁসর দুন্দুভি পড়া

জগঝম্প বাজে জোড়"।[৫০]

বণিক খণ্ডে ধনপতি দত্ত সন্তান কামনায় শুভক্ষণে বাসররাত্রি যাপন করেছেন। গ্রহশান্তি করেছেন, গৃহযজ্ঞ করেছেন। বেজেছে মঙ্গলবাদ্য–

"শঙ্খ বেনি বীণা   কাঁসড় ভেরি নানা

বাজএ বালিশ বাজনা"।[৫১]

খুল্লনার গন্ধ অধিবাস। মঙ্গলঘট স্থাপিত হয়েছে, আর বেজেছে কাঁসর–

"পটহ মৃদঙ্গ সানি   দগড় কাসর বেনি"।[৫২]

প্রতিমারূপী গৌরী পূজা পেলেন। মঙ্গল অনুষ্ঠান সাঙ্গ হল। মধ্যযুগের বাঙালির শুভ উৎসবের সুনিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন কবিকঙ্কণ।

শিঙ্গা : - মহিষের শৃঙ্গ দিয়ে তৈরী হয় শিঙ্গা। একালে শিঙের বদলে নানা ধাতু দিয়ে তৈরী হয় শিঙ্গা। কখন, কিভাবে, আদিমকালে কোন আরণ্যক মানুষ মৃত মহিষের শিঙে ফুঁ দিয়ে শিঙ্গা বাজিয়েছিল কে জানে। শিঙ্গা ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়। আরণ্যক মানুষ বিপদের পূর্ব মুহূর্তে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধবাদ্য হিসাবে শিঙা ব্যবহার করেছে।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিঙ্গা নিম্নলিখিত ভাবে উল্লিখিত হয়েছে–

১) শিঙ্গা (পৃঃ১২) ২) শিঙ্গা (পৃঃ৪৫) ৩) শিঙ্গা (পৃঃ৮৯)[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][৫৩]

দেবখণ্ডে শিবের বাদ্যযন্ত্ররূপে শিঙার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে–

'আরোহণ বৃষবরে   সিঙ্গা ডম্বুর করে

ভক্ষণ ধুতুরার ফল'।[৫৪]

শিঙ্গা মহিষের শিং দিয়ে তৈরী। মহিষের শিং কে বলে বিষাণ। শিঙ্গা হল বিষাণ শিল্প। শিঙা তৈরি করেন বিষাণ শিল্পীরা। আর যারা শিঙ্গা বাজান তাদের বলা হয় শিঙ্গাদার। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যাচ্ছে, মহিষ তাড়িয়ে মহিষের শিং উপড়ে ফেলেছেন কালকেতু। সেই শিং থেকে শিঙ্গা তৈরী করে কালকেতু শিঙ্গাদারকে হাটে বিক্রি করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"তাড়িয়া মহিষ ধরি উপাড়ে বিষাণ

সিঙ্গার পসরা করে ফুল্লরা বাজারে

পণমূলে শিঙ্গা জোড় বেচে সিঙ্গাদারে"।[৫৫]

মহাবীর কালকেতু পাশা খেলছেন। নানা বাদ্য বেজে চলেছে, বাজছে শিঙ্গা-

"বাদ্যের নাহী সীমা   দুন্দুভি বাজে দামা

ঘন বাজে শিঙ্গা কাড়া"।[৫৬]

এছাড়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নানা স্থানে শিঙ্গার উল্লেখ এসেছে। বণিক খণ্ডে শিঙ্গা উল্লিখিত হয়েছে নিম্নলিখিত ভাবে–

১) সিঙ্গা (পৃঃ১০১) ২) সিঙ্গা (পৃঃ১০৪) ৩) সিঙ্গা (পৃঃ১০৮) ৪) সিঙ্গা (পৃঃ১১৩) ৫) সিঙ্গা (পৃঃ১২৪) ৬) সিঙ্গা (পৃঃ১৫৩) ৭) সিঙ্গা (পৃঃ১৯৩) ৮) সিঙ্গা (পৃঃ১৯৩) ৯) সিঙ্গা (পৃঃ১৯৯) ১০) সিঙ্গা (পৃঃ২০৭) ১১) সিঙ্গা (পৃঃ২১১) ১২) রণসিঙ্গা (পৃঃ২১৩) ১৩) সিঙ্গা (পৃঃ২২৮) ১৪) সিঙ্গা (পৃঃ২৩১) ১৫) সিঙ্গা (পৃঃ২৫২) ১৬) সিঙ্গা (পৃঃ২৫৮) ১৭) সিঙ্গা (পৃঃ২৬৪) ১৮) সিঙ্গা (পৃঃ২৬৫) ১৯) সিঙ্গা (পৃঃ২৭৪) ২০) সিঙ্গা (পৃঃ২৭৫) ২১) সিঙ্গা (পৃঃ২৮১) ২২) সিঙ্গা (পৃঃ২৯৮) ২৩) সিঙ্গা (পৃঃ৩০১)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][৫৭]

ধনপতি সিংহলে বাণিজ্যের জন্য ডিঙ্গা সাজিয়েছেন। পাইকেরা কুলকুল করে শিঙ্গা বাজাচ্ছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"নাইআ পাইকের কুলকুলা ঘন বাজে সিঙ্গা"।[৫৮]

সেকালে শিঙ্গা বাজানো হত যুদ্ধবাদ্য রূপে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"লইআ আপন সেনা আগুদলে খানখানা

ঘন সিঙ্গা টমক নিশান"।[৫৯]

প্রকৃতপক্ষে শিঙ্গার দুটি ভাগ। একটি রামশিঙা অপরটি রণশিঙ্গা। রামশিঙ্গা সাধারণত পূজা–পার্বণ, বার–ব্রত প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বাজানো হয়। অপরপক্ষে রণশিঙ্গা যুদ্ধবাদ্য। যুদ্ধক্ষেত্রেই সাধারণত বাজানো হয়। এছাড়া আনন্দ উৎসবে এবং হিন্দুদের বড় কোন অনুষ্ঠানেও রণশিঙ্গা বাজানো হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে দুই ধরনের শিঙ্গার উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"বাজেমহল হৈল ডিঙ্গা ঘন বাজে রণসিঙ্গা"।[৬০]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিঙ্গার ব্যবহার প্রধানত যুদ্ধবাদ্যরূপে-

"বিজআ রণেতে সিঙ্গা বাজান শাম্ভবী"।[৬১]

আবার শ্রীমন্তের অভিষেকের মতো শুভ অনুষ্ঠানেও শিঙ্গার ব্যবহার লক্ষণীয়-

"ডানী বামে সিঙ্গা কাড়া টমক নিশান"।[৬২]

সিঙ্গা একালে একান্তই হারিয়ে যাওয়া লোকবাদ্য। কিন্তু এককালে সমাজের নানা প্রয়োজনে সিঙ্গার ব্যবহার হত। কবিকঙ্কণের কাব্যে সিঙ্গার ব্যবহার সম্পর্কে একটি তথ্যনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায়।

ডম্বুর, ডমরু, ডুগডুগি, ডিণ্ডিম: - বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের সুসজ্জিত শয়নকক্ষে নানা বাদ্যযন্ত্র ছিল। বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষে শয়নকক্ষেই বাদ্যযন্ত্র থাকত। নানা ধরনের বাদ্যের মধ্যে ডুগডুগি বা ডিণ্ডিমও ছিল। কোনো রমণী ডিণ্ডিম আলিঙ্গন করে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমন অবস্থাকে কবি বর্ণনা করেছেন, একপাশে প্রণয়ী, অপর পাশে পুত্র এই দুজনের মধ্যে ঐ নিদ্রিতা রমণীর মুখশ্রী শোভা পাচ্ছিল। মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন–

"ডিণ্ডিমং পরিগৃহ্যান্যা তথৈবাসক্তডিণ্ডিমা

সুপ্তপ্রতরুণং বৎসমুপগুহ্যেব ভামিনী"।[৬৩]

ডমরু 'আনদ্ধ' বা ঢাকা লোকবাদ্য। ঢাকা লোকবাদ্যগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি চামড়া দিয়ে ঢাকা। ডমরু কাঠ এবং চামড়া দিয়ে তৈরী। এর ভেতরের অংশ ফাঁপা থাকে। ডমরুর মাঝামাঝি অংশে সুতো দিয়ে ছোট লোহার টুকরো বা সিসা বাঁধা থাকে। হাতের প্রকৌশলে ডুগডুগি নাড়ালে সুতোয় বাঁধা লোহা বা সিসা চামড়ায় ধাক্কা লেগে শব্দ সৃষ্টি করে। এভাবেই ডুগডুগি বেজে ওঠে। ডুগডুগি শিবের বাদ্যযন্ত্র। একালে জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাঁদর খেলায় ডুগডুগি ব্যবহার করেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে ডুগডুগির বহুল ব্যবহার আছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে ডুগডুগির উল্লেখ নিম্নরূপ–

আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড : -

১) ডম্বুর (পৃঃ১২) ২) ডম্বুর (পৃঃ১৯) ৩) ডম্বুর (পৃঃ২৫) ৪) ডম্বুর (পৃঃ২৭) ৫) ডমরু (পৃঃ৩০) ৬) ডমরু (পৃঃ৩৫) ৭) ডম্বর (পৃঃ৯১) ৮) ডমরু (পৃঃ৯৯) ৯) ডিণ্ডিম ডমরু (পৃঃ২০৭) ১০) ডিণ্ডিমা ডম্বুর (পৃঃ২৬১)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][৬৪]

আখেটিক খণ্ডে শিব তার বাহন ষাঁড়ের উপর আরোহণ করেছেন। শিবের হাতে ডমরু। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"আরোহণ বৃষবরে সিঙ্গা ডম্বুর করে"।[৬৫]

শিব ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, সঙ্গে নিয়েছেন শিঙ্গা –

"আন বাঘ ছাল শিঙ্গা হাড়মাল"।[৬৬]

দেবী পূজায়ও ডমরু বাজে –

"শঙ্খ ঘন্টা ডম্ফ খমক জগঝম্প
বাজয়ে ডমরু বিধান"। [৬৭]

যুদ্ধক্ষেত্রেও ডমরুর শব্দ শুনিয়েছেন কবিকঙ্কণ–

"ডিণ্ডিম ডম্বর পুরএ অম্বর
ঘন বাজে জগঝম্প"।[৬৮]

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যতম বাদ্যরূপে যেমন ডমরু বাজে, তেমনি রুদ্ররূপা দেবী কালিকার শ্মশান নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাজে ডমরু –

"ডিণ্ডিমাডম্বরু মাতা ভরিআ মশানে"। [৬৯]

একান্তই পৌরাণিক এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার একালে কম। সেই সেকালের আরণ্যক ভয়ালতা, সেই যুগ পরিবেশ একালে আর নেই। ভারতীয় ঐতিহ্য এবং উত্তরধিকার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই লোকবাদ্যের তুলনা মেলা ভার।

বীণা, রুদ্রবীণা : - প্রাচীনকালে শয়নকক্ষে বীণা রাখা হত। রাবণের সুসজ্জিত শয়নকক্ষে বীণা রাখা ছিল। রাবণের শয়নকক্ষে কোনো রমণী বীণাকে আলিঙ্গন করে ঘুমিয়ে আছেন, মনে হচ্ছে যেন কোনো কামার্তা রমণী তাঁর বাঞ্ছিত প্রিয়তমকে নিয়ে গভীর নিদ্রায় ডুবে আছেন। পদ্মলোচনা এই রমণী আলিঙ্গন করেছেন ত্রিতন্ত্রী বীণা। মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন–

"কাচিদ্বীণাং পরিষ্বজ্য সুপ্তা কমললোচনা।
বরং প্রিয়তমং গৃহ্য সকামেব হি কামিনী"।[৭০]

সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বীণা গুরুত্বপূর্ণ লোকবাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বীণা 'তত' বাদ্যযন্ত্র। অর্থাৎ তারের তৈরী বাদ্যযন্ত্র। তারের তৈরী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণা

শ্রেষ্ঠ। বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আর এক নাম 'বীণাবাদিনী'। দেবী সরস্বতী 'বীণাধারিণী'ও। সাধারণত কাঠ দিয়ে তৈরী হয় বীণা। বীণা সাতটি তারের সমন্বয়। লাউয়ের শুকনো খোলের আকারের দুদিকে দুটি মস্তকে তার বাঁধা থাকে। আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে বীণার প্রকার অনেক। এমনই এক প্রকার বীণা হল রুদ্রবীণা। বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় রুদ্রবীণা রক্ষিত আছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বীণা এবং রুদ্রবীণা দু'য়ের উল্লেখ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বীণার উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে–

আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড : -

১) বীণা (পৃঃ২) ২) বীণা (পৃঃ২০) ৩) বীণা (পৃঃ৮৭ -দু'বার উল্লিখিত) ৪) বীণা (পৃঃ৯৭) ৫) বীণা (পৃঃ১১০) ৬) বীণা (পৃঃ১৭৪)

৭) বীণা (পৃঃ১৯৭) ৮) রুদ্রবীণা (পৃঃ২৭১)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][৭১]

আখেটিক খণ্ডের অন্তর্গত দেবী সরস্বতীর বন্দনা অংশে বীণার উল্লেখ আছে। সরস্বতী বীণাবাদিনী দেবী। তিনি 'কবিমুখে অষ্টাদশ ভাষা' সঞ্চার করেন। এক আশ্চর্য স্বর্গলোকের কাল্পনিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন কবি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"রবাব খমক বেনি সপ্তস্বরা পিনাকিনী
বীণা বেণু মৃদঙ্গ-বাদিনী"।[৭২]

দেবলোকে হরগৌরীর বিবাহ মঙ্গল অনুষ্ঠানে বীণা বাজে–

"শঙ্খ বেণু বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
বাজনে হইল কোলাহল"।[৭৩]

গুজরাট নগরেও প্রতি সন্ধ্যাকালে বাজে বীণা, জ্বলে দীপ–

"প্রতিঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে
শঙ্খ ঘন্টা বাজে বীণা বেনি"। [৭৪]

বণিক খণ্ডে ধনপতি দত্ত পুত্র লাভ কামনায় শুভযোগে, শুভদিনে, যজ্ঞ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে বীণা বেজেছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"শঙ্খ বেনি বীণা কাঁসড় ভেরি নানা

বাজএ বালিশ বাজনা"।[৭৫]

আবার সাধু ধনপতি দত্ত বাণিজ্য যাত্রা করেছেন। খুল্লনা করছেন চণ্ডীপূজা, বেজে উঠেছে বীণা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"দুন্দুভি শঙ্খ বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা

বাজনে পূজেন তরণী"।[৭৬]

বণিক খণ্ডে যুদ্ধবাদ্য রূপে রুদ্রবীণার উল্লেখ এসেছে–

"রায় বেনি গজবেনি বাজে রুদ্রবীণা

দগড় দগড়ি বাএ শত শত জনা"।[৭৭]

এছাড়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বেনি অর্থে বাঁশী বা রুদ্রবীণার উল্লেখও আছে। গুজরাট নগরে প্রতি সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরে বেনি বাজে–

"শঙ্খ বেনি বীণা ভেরি ভরে নানা

বাদ্য বাজে ঘরে ঘরে"[৭৮]

কিংবা

"প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বেনি"।[৭৯]

আখেটিক খণ্ডে যুদ্ধবাদ্য রূপেও বেনির উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ–

"ঘন বাজে সানি রণ জয়-বেনি

গুজরাটে উঠিল কম্প"।[৮০]

পুরাণের দেবী সরস্বতীর সুন্দর মূর্তি বীণাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। বীণার ব্যবহার একালে কম। তবুও ভারতীয় প্রতিমাতত্ত্বে দেবী সরস্বতীর প্রশান্ত মূর্তি রূপ পায় বীণা বাদিনী রূপে। আবদুল ওয়াহাব তাঁর 'বাংলার লোকবাদ্য' গ্রন্থে লিখেছেন- "এটি সরু দুই বা আড়াই ইঞ্চি পরিধিযুক্ত বাঁশের দণ্ড দুটো লাউয়ের সঙ্গে যুক্ত করে তৈরী হয়। বাঁশের দণ্ডের মাপ ও লাউয়ের খোলের পরিধি নির্দিষ্ট থাকে। লাউ দুটো হতে হবে সুন্দর ও গোলাকার। আজকাল সাধারণত কাঠ দিয়ে এ যন্ত্র তৈরী করা হয়ে থাকে।" [৮০(ক)]

মৃদঙ্গ: - মৃদঙ্গ মাটির তৈরী বাদ্যযন্ত্র। '✓মৃদ্+ অঙ্গ' –অর্থাৎ মৃৎ অঙ্গ যার। প্রাচীনকালে মৃদঙ্গ মাটির তৈরী হত। একালে মৃদঙ্গ কাঠের তৈরী হয়। মৃদঙ্গ প্রায় আড়াই ফুটের মতো লম্বা হয়। মৃদঙ্গের দুই দিকে চামড়া টান দিয়ে ঢাকা থাকে। মৃদঙ্গ বাজানোর সময় গুরুগম্ভীর শব্দ হয়। মধ্যযুগে কাঠের তৈরী মৃদঙ্গের পরিচয় পাওয়া গেছে। কাঠের মাদলকেও মৃদঙ্গ বলা হয়। মৃদঙ্গ নানা শুভ অনুষ্ঠানে এবং কীর্তন গানে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া নৃত্যের সময় মৃদঙ্গ বাজানো হয়। কুম্ভকার বা কুমোরেরা মাটির মৃদঙ্গ তৈরী করেন। আবদুল ওয়াহাব তাঁর 'বাংলার লোকবাদ্য' গ্রন্থে লিখেছেন- "আবার পাখোয়াজকেও মৃদঙ্গ বলা হয়ে থাকে। তবে আকৃতিগত দিক থেকে মৃদঙ্গের সঙ্গে পাখোয়াজের খানিকটা পার্থক্য আছে।" [৮০(খ)] কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মৃদঙ্গের উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিত ভাবে–

আখেটিক খণ্ড: -

১) মৃদঙ্গ (পৃঃ২) ২) মৃদঙ্গ (পৃঃ২০) ৩) মৃদঙ্গ (পৃঃ৩০) ৪) মৃদঙ্গ (পৃঃ৩৫) ৫) মৃদঙ্গ (পৃঃ৫২) ৬) মৃদঙ্গ (পৃঃ৮২) ৭) মৃদঙ্গ (পৃঃ৮৭)

বণিক খণ্ড: -

১) মৃদঙ্গ (পৃঃ১১০) ২) মৃদঙ্গ (পৃঃ১২২) ৩) মৃদঙ্গ (পৃঃ১২৫) ৪) মৃদঙ্গ (পৃঃ১৯৭) ৫) মৃদঙ্গ (পৃঃ২১১) ৬) মৃদঙ্গ (পৃঃ৩০৪)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][৮১]

সরস্বতী বন্দনা অংশে মৃদঙ্গের উল্লেখ করেছেন কবি–

"বীণা বেণু মৃদঙ্গ-বাদিনী"। [৮২]

হরগৌরীর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানে বেজেছে মৃদঙ্গ–

"শঙ্খ বেণু বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা"।[৮৩]

গুজরাট নগরে প্রতি সন্ধ্যাকালে বাজে মৃদঙ্গ, হরিনাম সংকীর্তন হয়–

"মৃদঙ্গ বল্লকি বাজে সানি"।[৮৪]

গুজরাট নগরের কুম্ভকারেরা মাটি দিয়ে মৃদঙ্গ তৈরী করেন-

"কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পিটে

মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া"।[৮৫]

বণিক খণ্ডে স্বর্গ নর্তকী রত্নমালা নৃত্য করছেন। আর দেবতারা দেখছেন। মৃদঙ্গের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে –

"তাতিনি তাতিনি তিনি মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি"।[৮৬]

ধনপতি এবং খুল্লনার বিবাহে বেজেছে মৃদঙ্গ –

"মৃদঙ্গ পটহ বাজে বেনি জোড়া শঙ্খ"।[৮৭]

নৌযাত্রার সময়ে নানা বাদ্যযন্ত্র সহকারে নৌকাকে পূজা করা হয়। ধনপতি দত্ত নৌকাকে এভাবে পূজা করেছেন –

"দুন্দুভি শঙ্খ বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা

বাজনে পূজেন তরণী"।[৮৮]

সেকালে কোনো শুভ সংবাদের খবর মৃদঙ্গ বাজিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হত –

"শৃঙ্গশঙ্খে হইল রোল অন্ত নাহি ঢাক ঢোল

কাড়া মৃদঙ্গ করতাল"।[৮৯]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ অংশে শ্রীমন্তের বিবাহ উৎসবে বেজেছে মৃদঙ্গ। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"মৃদঙ্গ মঙ্গল-পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ"।[৯০]

বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডের দশম শ্লোকে মহাকবি রাবণের শয়নকক্ষের পরিচয় দিয়েছেন। শয়নকক্ষে রাখা পালঙ্কের পায়া হাতির দাঁতের নির্মিত। পালঙ্ক স্ফটিক নির্মিত বেদিকার উপর রাখা। বেদি পদ্মরাগ ও বৈদূর্য্যমণি দিয়ে তৈরী। কবি বলেছেন, কোনো রমণী এমন শয্যায় ঘুমন্ত অবস্থায় চোখ বন্ধ করে, মৃদঙ্গ আঁকড়ে আবার গভীর ঘুমে ডুবে যাচ্ছে। বোঝা যায়, সেকালে শয়নকক্ষে মৃদঙ্গ থাকত। মহাকবি লিখেছেন–

"মৃদঙ্গং পরিবিধ্যাঙ্গৈঃ প্রসুপ্তা মত্তলোচনা"।[৯১]

শঙ্খ : - শঙ্খ সমুদ্র থেকে সংগৃহীত মৃত শামুকের খোলা। এমন শামুকের খোলা থেকে শাঁখারী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা শঙ্খ তৈরী করেন। শঙ্খ একদিকে যেমন লোকবাদ্য, অপরদিকে তেমনি শাঁখারিরা শঙ্খকে কেটে শাঁখা তৈরী করেন। এছাড়া শঙ্খের অলংকার প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। শঙ্খশিল্পী শঙ্খের নির্দিষ্ট স্থানে ছিদ্র করেন। ফুঁ দিয়ে বাতাস সংযোগে শঙ্খ বাজানো হয়। হিন্দু পুরাণে শঙ্খের উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খাসুরকে (পঞ্চজন নামে অসুর) হত্যা করে তার অবয়ব গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু সমাজে শঙ্খধ্বনি মঙ্গলের সূচক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। হিন্দুদের পূজা পার্বণ, বিবাহ, সামাজিক ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শঙ্খ বাজানো হয়। সামাজিক মানুষ শঙ্খকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার বিশ্বাস গড়ে তুলেছে। শঙ্খের সাদা রং পবিত্রতার প্রতীক। শঙ্খধ্বনি অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে, সমস্ত অমঙ্গল দূর করে। শঙ্খের উপর শিল্পীরা নানা অলংকরণ করেন। শিল্পীরা ফুল, পাতা, পদ্ম প্রভৃতি মোটিফ অঙ্কন করেন। হিন্দুদের বিবাহে শঙ্খধ্বনি এক আবশ্যিক মাঙ্গলিক রীতি। 'Dictionary of Symbols' গ্রন্থে শঙ্খ সম্পর্কে বলা হয়েছে– "The conch is itself Lakshmi, too, Vishnu's shakti, wealth and beauty."[৯২]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্য জুড়ে শঙ্খের উল্লেখ এসেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে শঙ্খ এসেছে নিম্নরূপে–

আখেটিক খণ্ড: -

১) শঙ্খ (পৃঃ৭) ২) শঙ্খ (পৃঃ২০) ৩) শঙ্খ (পৃঃ২০) ৪) শঙ্খ (পৃঃ৩০- দু'বার উল্লিখিত) ৫) শঙ্খ (পৃঃ৩৫) ৬) শঙ্খ (পৃঃ৫৫) ৭) শঙ্খ (পৃঃ৫৯) ৮) শঙ্খ (পৃঃ৮০) ৯) শঙ্খ (পৃঃ৮৭ - দু'বার উল্লিখিত)।

বণিক খণ্ড : -

১) শঙ্খ (পৃঃ১১০) ২) শঙ্খ (পৃঃ১১২) ৩) শঙ্খ (পৃঃ১২২) ৪) শঙ্খ (পৃঃ১২৩) ৫) শঙ্খ (পৃঃ১২৪ - দু'বার উল্লিখিত) ৬) শঙ্খ (পৃঃ১২৫) ৭) শঙ্খ (পৃঃ১৩৮) ৮) শঙ্খ (পৃঃ১৪৭) ৯) শঙ্খ (পৃঃ১৬১) ১০) শঙ্খ (পৃঃ১৬২) ১১) শঙ্খ (পৃঃ১৭২) ১২) শঙ্খ (পৃঃ১৭৩) ১৩) শঙ্খ (পৃঃ১৭৪) ১৪) শঙ্খ (পৃঃ১৯১) ১৫) শঙ্খ (পৃঃ১৯২) ১৬) শঙ্খ (পৃঃ১৯৩) ১৭) শঙ্খ (পৃঃ১৯৪) ১৮) শঙ্খ (পৃঃ১৯৭) ১৯) শঙ্খ (পৃঃ১৯৮) ২০) শঙ্খ (পৃঃ২০০) ২১) শঙ্খ (পৃঃ২৩২) ২২) শঙ্খ (পৃঃ২৫০) ২৩) শঙ্খ (পৃঃ২৫৪) ২৪) শঙ্খ (পৃঃ৩০০) ২৫) শঙ্খ (পৃঃ৩০৩ -দু'বারউল্লিখিত) ২৬) শঙ্খ (পৃঃ৩০৪)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।] [৯৩]

গৌরীর বিবাহ অনুষ্ঠানে মঙ্গলসূত্র বাঁধার সময়ে শঙ্খদান করা হয়েছে–

"স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্পূর

শঙ্খ দিল যথাবিধি"।[৯৪]

গুজরাট নগরে বণিক বৈশ্যরা এসেছেন। নৌকা - সাজিয়ে এনেছেন শঙ্খ এবং চন্দন–

"সাজন করিআ নায় নানা সফয় যায়

শঙ্খ চন্দন ভরি আনে"।[৯৫]

গুজরাট নগরে প্রতি সন্ধ্যায় শঙ্খ বেজে ওঠে –

"প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বেনি"। [৯৬]

সুন্দরী খুল্লনা ব্রত পালন করছেন, পরেছেন শাঁখা –

"গলে সতেশ্বরি হার শোভে নানা অলংকার

করে শঙ্খ শোভে তাড়বালা"।[৯৭]

শুভদিনে বিবাহ উপলক্ষ্যে খুল্লনার গন্ধ অধিবাসে বেজেছে শঙ্খ-

"শঙ্খ কাজে দোখণ্ডী বল্লকী"।[৯৮]

মঙ্গল অনুষ্ঠানে শঙ্খ প্রদানের রীতি আছে –

"সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ ভুবনে উপামা–রঙ্ক

পূর্ণ পাত্র প্রিদিপ সহিত"। [৯৯]

বিবাহে কন্যাদান উপলক্ষ্যে শঙ্খ বাজানো হয় –

"সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পট্টহ দুন্দুভি বেনি"।[১০০]

খুল্লনা চণ্ডী পূজা করেছেন. কুমারীরা শঙ্খ ধ্বনি দিয়েছেন –

"সঘনে দেই শঙ্খধ্বনি"। [১০১]

আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করার সময়, মঙ্গল অনুষ্ঠানে শঙ্খ বাজানো হয় –

"শঙ্খ বাজে জোড়া সানি চৌদিগে মঙ্গল ধ্বনি

জলখেলা করে রামাগণ"।[১০২]

পুত্রকামনায় শুভক্ষণে বাসর সজ্জায় শঙ্খ ধ্বনি করা হয় –

"শঙ্খ বেনি বীণা কাঁসড় ভেরি নানা

বাজএ বালিশ বাজনা"।[১০৩]

ধনপতি বাণিজ্য বিনিময়ের জন্য শঙ্খ নৌকায় ভরে নিয়েছেন–

"সসুরা আছিলা রঙ্ক আনিতা চন্দন শঙ্খ

সাজন করিআ সাত নায়"।[১০৪]

নৌকায় বাণিজ্য যাত্রার সময় শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে শঙ্খকে পূজা করা হয়-

"দুন্দুভি শঙ্খ বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা

বাজনে পুজেন তরণী"।[১০৫]

শঙ্খধ্বনি দিয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনায় খুল্লনা চণ্ডীপূজা করেছেন-

"দিআ শঙ্খ জয়ধ্বনি বধূ পূজে একাকিনী"।[১০৬]

সিংহল থেকে বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনপতি শঙ্খ ভরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন–

"আনিবারে গেল শঙ্খ চাঁমর চন্দনে"। [১০৭]

সিংহল দেশ থেকে ধনপতি নারকেলের বদলে নিয়ে এসেছেন শঙ্খ –

"কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে নারিকেল বদলে শঙ্খ"। [১০৮]

এক প্রজন্ম পরে বাণিজ্যের মাধ্যমে শ্রীমন্তও শঙ্খ নিয়ে এসেছেন –

"শকটে আরপী শঙ্খ–চন্দনের ভরা"। [১০৯]

সিংহলরাজ কন্যা দান করছেন। বেজে উঠেছে শঙ্খ-

"সপ্তস্বরা শঙ্খ ধ্বনি"।[১১০]

পরিশেষে নবদম্পতির বিবাহে বেজে উঠেছে মঙ্গল শঙ্খ–

"মৃদঙ্গ মঙ্গল-পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ"।[১১১]

এছাড়াও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শঙ্খের উল্লেখ রয়েছে নিম্নলিখিত ভাবে– ১) শঙ্খ (পৃঃ১০২) ২) শঙ্খ(পৃঃ১০৪) ৩) শঙ্খ (পৃঃ২০৯– দু'বার উল্লিখিত) ৪) শঙ্খ (পৃঃ২৩১) ৫) শঙ্খ (পৃঃ২৪৬) ৬) শঙ্খ (পৃঃ২৭৪- দুবার উল্লিখিত) ৭) শঙ্খ (পৃঃ২৮৮) ৮) শঙ্খ (পৃঃ২৯০) ৯) শঙ্খ (পৃঃ২৯৪) ১০) শঙ্খ (পৃঃ২৯৫ -দু'বার উল্লিখিত) ১১) শঙ্খ (পৃঃ২৯৬)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][১১২]

এছাড়াও যুদ্ধবাদ্যরূপে জয় শঙ্খের ব্যবহার আছে কাব্যে। পশুদের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধে জয়শঙ্খের উল্লেখ আছে –

"মার মার বীর ডাকে বান এড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে

সঘনে বাজায় জয়শঙ্খ"।[১১৩]

একালের যুদ্ধে জয়শঙ্খ বাজে না। যুদ্ধ বাদ্যরূপে মঙ্গল শঙ্খ কোনো সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় না।রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যে মঙ্গল শঙ্খের উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের একটি কালকে চিহ্নিত করেছেন কবি মুকুন্দরাম। সমকালকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার কাব্যে ধরে রেখেছেন কবিকঙ্কণ।

ঢাক, পটহ : - ঢাক প্রাচীন লোকবাদ্য। কাঠের খোলকে সংযুক্ত করে চামড়া দিয়ে ঢেকে ঢাক তৈরী করা হয়। চামড়ার অংশে আঘাত করে কাঠি দিয়ে ঢাক বাজানো হয়। চর্মকার বা মুচি সম্প্রদায়ের শিল্পীরা ঢাক তৈরী করেন। ঢাকের আওয়াজ খুবই দূরবর্তী। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের অনুষ্ঠানে, মাঙ্গলিক বিবাহ অনুষ্ঠানে, গাজনে, চড়কে, বিশেষত দুর্গোৎসবে ঢাক বাজানোর রেওয়াজ আছে। ঢাককে ডঙ্কাও বলা হয়। বড় ঢাককে বলা হয় জয়ঢাক। মূলত যুদ্ধবাদ্য রূপে ব্যবহৃত ঢাককে জয়ঢাক বলে। ঢাকী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা ঢাক বাজায়। ঢাকীদের তাল এবং লয় জ্ঞান প্রখর থাকতে হয়। আধুনিক যন্ত্র শিল্পের রমরমায় ঢাকের প্রচলন কমে এসেছে, ঢাকীরা হারিয়ে যাচ্ছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ঢাকের উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে–

আখেটিক খণ্ড: -

১) ঢাক (পৃঃ৮৮) ২) ঢাক (পৃঃ৮৯)।

বণিক খণ্ড: -

১) ঢাক (পৃঃ১০৪) ২) বীরঢাক (পৃঃ২০৭) ৩) ঢাক (পৃঃ২১১) ৪) ঢাক (পৃঃ২৬১) ৫) ঢাক (পৃঃ২৬৪) ৬) বীরঢাক (পৃঃ২৬৯) ৭) জয়ঢাক (পৃঃ২৭১) ৮) বীরঢাক (পৃঃ২৭১)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][১১৪]

গুজরাট নগর নির্মাণ হয়েছে। ভাঁড়ু দত্তের প্ররোচনায় ঈর্ষা পরায়ণ হয়েছে প্রতিবেশী কলিঙ্গ দেশ। চারিদিকে যুদ্ধের আবহ। যুদ্ধশীল সেনাপতি কালকেতু রণসাজে সজ্জিত। বেজে উঠেছে ঢাক–

"সাজ সাজ পড়ে ডাক দামা দড়মসা ঢাক
কলিঙ্গে উঠিল গন্ডগোল"।[১১৫]

বণিক খণ্ডে যুদ্ধবাদ্য রূপে বীরঢাকের উল্লেখ এসেছে–

"মার মার বলিআ কোটাল ছাড়ে ডাক
দুইদলে রণপড়া বাজে বীরঢা"।[১১৬]

আবার বণিক খণ্ডে যুদ্ধবাদ্য রূপে জয়ঢাকের সঙ্গে বীরঢাকের উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ-

'জয়ঢাক বীরঢাক ব্যালিষ বাজনা

প্রলয়সমএ জেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা '।[১১৭]

এছাড়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পটহ (ধ্বন্যাত্মক শব্দ সৃষ্টিকারী বাদ্যযন্ত্র ঢাক) এর উল্লেখ রয়েছে নিম্নলিখিতভাবে –

১) পটহ (পৃঃ১২৪) ২) পটহ (পৃঃ১২৫) ৩) পটহ (পৃঃ২৯০) ৪) পটহ (পৃঃ৩০৩)।(পৃঃ২৭১)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][১১৮]

ঢাককে পটহ নামেও অভিহিত করা হয়। তবে ঢাক এবং পটহের মধ্যে কিছু তফাৎ রয়েছে। আবদুল ওয়াহাব তাঁর 'বাংলার লোকবাদ্য' গ্রন্থে লিখেছেন- "এই (পটহ) লোকবাদ্যটির নাম ট্যামটেমি। এটি প্রতিবারই বাজানোর আগে আগুনের মধ্যে অথবা রৌদ্রে তাতিয়ে নিতে হত।" [১১৮(ক)] প্রাচীনকালে শয়নকক্ষে পটহ রাখা হত। রাবণের শয়নকক্ষে পটহ রাখা ছিল। সুন্দরাকাণ্ডের একাদশ সর্গে দেখা যাচ্ছে, কোনো রমণী প্রবাসী প্রেমিককে পেয়ে বহুদিন পরে যেমন গাঢ় আলিঙ্গনে শয়ন করে, তেমনি কোনো সুস্তনী রমণী 'পটহ' আলিঙ্গন করে গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছেন। মহাকবি লিখেছেন–

"পটহং চারুসর্ব্বাঙ্গী ন্যস্য শেতে শুভস্তনী

চিরস্য রমণং লব্ধা পরিষ্বজেব্য কামিনী।"[১১৯]

ঢোল, খোল : - ঢোল কাঠ ও চামড়া দিয়ে তৈরী। কিন্তু ঢাক যেমন কাঠি দিয়ে বাজানো হয়, তেমনি ঢোল বাজানো হয় করতল এবং আঙুল দিয়ে। কখনো কখনো ছোট কাঠি দিয়ে ঢোল বাজানো হয়। চর্মকার বা চামার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা ঢোল তৈরী করেন। আর যারা ঢোল বাজান তাদের বলা হয় ঢুলি। ঢাকের মতো ঢোলও প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। গ্রামসমাজে বাঙালির নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ঢোল বাজে। পূজা–পার্বণ, বিবাহ, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মঙ্গলবাদ্য রূপে ঢোল বাজানো হয়। ঢাকের থেকে ঢোল আকারে ছোট

হয়। আখেটিক খণ্ডে যুদ্ধবাদ্য রূপে ঢোলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। কালকেতুর যুদ্ধ সজ্জায় বেজেছে ঢোল–

"আশি গণ্ডা বাজে ঢোল   তের কাহন সাজে কোল

করে ধরে কাঁড় তিন কাঠ"।[১২০]

কিংবা,

"সানি বাজে ঢোল   চৌদিগে গণ্ডগোল

ডিমিডিমি বাজএ পড়া"।[১২১]

বণিক খণ্ডে ঢোলের উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে–

১) ঢোল (পৃঃ১০২) ২) খোল (পৃঃ১০৪) ৩) ঢোল (পৃঃ১০৪) ৪) ঢোল (পৃঃ১০৬) ৫) ঢোল (পৃঃ১০৮) ৬) ঢোল (পৃঃ২১১) ৭) ঢোল (পৃঃ২৬১) ৮) ঢোল (পৃঃ২৭১) ৯) খোল (পৃঃ২৭৬) ১০) জয়ঢোল (পৃঃ২৮১)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][১২২]

বণিকখণ্ডে কমলে কামিনীর কথা মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছে। রাজা শালবান ঢাক ঢোল বাজিয়ে কমলে কামিনীর কথা প্রচার করছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"শৃঙ্গশঙ্খে হইল রোল   অন্ত নাহি ঢাক ঢোল

কাড়া মৃদঙ্গ করতাল"।[১২৩]

কবিকঙ্কণের কাব্যে রামায়ণের প্রভাব আছে। হনুমান যেমন গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে এসেছিলেন বিশল্যকরণী খুঁজে না পেয়ে। অবশেষে লক্ষণ বেঁচেছিলেন। অনুরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহল নগরের মৃত সেনারা জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এমনই ওষুধির গুণে। আর বেজে উঠেছিল জয়ঢোল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"ঢেমচাঁ টমক সিঙ্গা বাজে জয় ঢোল"।[১২৪]

ঢোল আজও বাজে। কিন্তু সামাজিক সংহতিতে একান্ত নিবিষ্ট ছিল যে মুচি সম্প্রদায়ের শিল্পীরা, সেই তারা গেছে হারিয়ে। সামাজিক অবহেলাকে অস্বীকার করে নিজেদের প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে তারা টিকে ছিলেন। কিন্তু একালে তারা গেছেন হারিয়ে।

আবদুল ওয়াহাব তাঁর 'বাংলার লোকবাদ্য' গ্রন্থে লিখেছেন- "তাল ও সুর অনুসারে ঢোলের বাদ্যধ্বনি কখনও 'ডুগডুগ' কখনও 'দিদং ডুং ডুংগ।" [১২৪(ক)]

ঘণ্টা: - ঘণ্টা ধাতু শিল্প। ঘণ্টা সাধারণত পিতল বা কাঁসার তৈরী। কখনো কখনো লোহা দিয়ে তৈরী হয় ঘন্টা। ঘণ্টা দেখতে কিছুটা ধুতরা ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট। ঘণ্টার উপরে ধরার জায়গা থাকে। ভেতরের দেওয়ালে লোহা বা কাঁসরে দোলানো গুটি দিয়ে আঘাত করলে শব্দ সৃষ্টি হয়। ঘন্টা ঢং ঢং শব্দ করে বাজে। ঘণ্টা পূজা–পার্বণ এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বাজানো হয়। ঢোকরা কামারেরা কাঁসা পিতলের ঘন্টা তৈরী করেন। অনেক মন্দিরের সামনে ঘণ্টা ঝোলানো থাকে। এমন ঘণ্টা আকারে বড় হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে ঘণ্টার উল্লেখ এসেছে নিম্নরূপে–

আখেটিক খণ্ড : -

১) ঘণ্টা (পৃঃ ৩০) ২) ঘণ্টা (পৃঃ ৬৪) ৩) ঘণ্টা (পৃঃ ৮৭) ৪) গজ ঘণ্টা (পৃঃ৮৮) ৫) রণ ঘণ্টা (পৃঃ ৮৮)

বণিক খণ্ড: -

১) জয় ঘণ্টা (পৃঃ ৯২) ২) ঘণ্টা (পৃঃ ৯৯) ৩) ঘণ্টা (পৃঃ ২৭১) ৪) ঘণ্টা (পৃঃ ২৭২)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][১২৫]

আখেটিক খণ্ডে কলিঙ্গ দেশের রাজা হৈমবতীর পূজা করছেন। প্রতি ঘরে বেজে উঠেছে শঙ্খ ঘণ্টা–

"পূজেন নরপতি আনন্দে হৈমবতী

ব্রাহ্মণ মেলি বেদ গান"।[১২৬]

কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গ রাজের যুদ্ধে বেজে উঠেছে গজঘন্টা–

"কাট কাট বলি তাজে কলিঙ্গন পতি সাজে

গজঘন্টা বাজে উতরোল"।[১২৭]

যুদ্ধবাদ্যরূপে যখন ঘণ্টা বাজে তখন তাকে রণঘণ্টাও বলা হয়–

"রণসিংহ রণভীম ধায় রণঘণ্টা"।[১২৮]

জয়সূচক বাদ্যযন্ত্ররূপে ঘন্টার ব্যবহার হয়। এমন ঘণ্টাকে জয়ঘণ্টা বলে–

"বিষম সমরে ধীর কিচকিন্দা আইল বীর

জয়ঘণ্টা বাজাইআ নিসান"।[১২৯]

একালে ঘণ্টা মূলত মঙ্গলদ্রব্য বা ধর্মীয় লোকশিল্পরূপেই ব্যবহৃত হয়। ধর্ম জীবনকে শীলিত করে। আর ধর্মাচরণের জন্য আচার এবং প্রথাকে মান্যতা দেওয়া হয়। উপকরণ বা মঙ্গলদ্রব্যের মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মানুষ নিষ্ঠাভরে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করে। হিন্দুধর্ম প্রাচীন ধর্ম। হিন্দুদের পূজা অর্চনা, নৈবেদ্য এবং হোমের জন্য ধর্মীয় লোকশিল্পের ব্যবহার হয়। বহু দেববাদ হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলতঃ বাংলার লোকশিল্পে ধর্মীয় প্রভাব অনেক। Shanti Swarup তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন– "Handicrafts [.........] in their varied forms they reflect a religio – philosophical idealism, a joy in the appreciation of radiant ornamentation, and an imagination that draws upon every phase of God's creation."[১৩০]

<u>**সানি, সানাই:-**</u> সানি বা সানাই এক প্রকার বাঁশী। কাঠ এবং পিতলের তৈরি বাঁশী হল সানাই। সানাই দেখতে অনেকটা লম্বাটে করবী ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট। দীর্ঘ বাঁশের নলের মত অবয়বে সাতটি ছিদ্রের সাহায্যে সানাই তৈরি করা হয়। এই ছিদ্রগুলিকে স্বরছিদ্র বলা হয়। মুখে ফুঁ দিয়ে সানাইয়ে সুর দেওয়া হয়। সানাইয়ের সুর বিষণ্ণ। সানাই মঙ্গলবাদ্য। বিশেষত বিবাহে সানাই বাজানো হয়। এছাড়া প্রাচীন রাজপ্রাসাদে এবং মন্দিরেও সানাই বাজানো হয়। আবদুল ওয়াহাব তাঁর 'বাংলার লোকবাদ্য' গ্রন্থে লিখেছেন- "সানাই বাজাবার মুখ-রন্ধ্র উপরের দিকে। মুখরন্ধ্রে দুটো শর বা নলের পাত থাকে। অর্থাৎ যুগ্ম রিভ বা পাত ব্যবহারে সানাই বাজাতে হয়।"[১৩০(ক)]

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডে সানাইয়ের উল্লেখ আছে। খুল্লনার বিবাহ আয়োজন। গন্ধ অধিবাস উপলক্ষ্যে বেজেছে সানাই–

"পটহ মৃদঙ্গ সানি দগড় কাসর বেনি

শঙ্খ কাজে দোখণ্ডি বল্লকী"।[১৩১]

খুল্লনার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। বরকনে দোলাতে চেপে চলেছেন। বেজেছে সানাই-

"টমক খমক সানি   বাজে জগঝম্প"।[১৩২]

দূর সমুদ্রপারের দেশে নেমে ধনপতি দত্তের পদাতিক সৈন্যরা বাজিয়েছেন সানাই-

"ঘন জয়-সানি   রণজয় যেনি

সিংহলে উঠিল কম্ফ"।[১৩৩]

যুদ্ধবাদ্যরূপেও সানাইয়ের উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ-

"সমরে দুন্দুভি বেনি   রণপড়া বাজে সানি

কোলাহল হইল সুরপুরে"।[১৩৪]

সানাই আজো বাজে। তবে একালের সানাই। আর লোকশিল্পীরা সানাই তৈরি করেন না। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বাদ্যযন্ত্রের দাপটে সানাই আজ একান্তই হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্প। একালে সানাই তৈরি হয় বহুজাতিক কোম্পানির কারখানা ঘরে।

টমক:- ধ্বন্যাত্মক শব্দ সৃষ্টিকারী একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র হল টমক। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডের নানা স্থানে টমকের উল্লেখ আছে। লক্ষণীয়, টমক এবং খমক এই দুটি বাদ্যযন্ত্র কবিকঙ্কণের কাব্যে অনেক ক্ষেত্রে পাশাপাশি উল্লিখিত হয়েছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে টমকের উল্লেখ নিম্নরূপ- ১) টমক খমক (পৃঃ১১০) ২) টমক খমক (পৃঃ১২২) ৩) টমক খমক (পৃঃ ১২৫) ৪) টমক (পৃঃ ১৫৩) ৫) টমক (পৃঃ১৯৩) ৬) টমক (পৃঃ২১১) ৭) টমক (পৃঃ২২৮) ৮) টমক (পৃঃ২৩১) ৯) টমক (পৃঃ২৫২) ১০) টমক (পৃঃ২৮১) ১১) টমক (পৃঃ২৯৮)১২) টমক (পৃঃ৩০১) ১৩) টমক খমক (পৃঃ৩০৪)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][১৩৫]

কবিকঙ্কণের কাব্যে দেখা যাচ্ছে, বণিক খণ্ডে উৎসব এবং নৃত্যে টমকের উল্লেখ এসেছে-

"দোহার তম্বুরে গায়   টমক খমক বায়।

পিনাক বাজায় কুতূহলি"।[১৩৬]

খুল্লনার বিবাহ উৎসব। গন্ধ অধিবাসে বেজেছে টমক-

"টমক খমক ভেরি জগঝম্প সারি সারি

অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নৃত্তকী"।[১৩৭]

দোলায় চড়ে বরকনে চলেছেন। বেজেছে টমক-

'টমক খমক সানি বাজে জগঝম্প'।[১৩৮]

পাটের দোলা চড়ে ধনপতি নগরে ফিরেছেন। উৎসবের আবহে বেজেছে টমক-

'সিঙ্গা কাড়া টমক বাজনে উতরোল'।[১৩৯]

বিদেশের বাণিজ্যে আছে বিপদ, সেক্ষেত্রে টমক সিঙ্গাও এমন বিপদ দূর করতে পারে না-

"কি করে টমক সিঙ্গা পক্ষে ছুঞা লয় ডিঙ্গা

সেই দেশে সঙ্কট জীবন"।[১৪০]

কমলে কামিনী আবির্ভাবের সাধারণ ঘোষণায় বেজে ওঠে টমক। যুদ্ধবাদ্যরূপেও টমকের ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে কাব্যে-

"ঘন সিঙ্গা টমক নিশান"।[১৪১]

শুভক্ষণে শ্রীমন্তের রাজ অভিষেকেও বাজে টমক-

'ডানি বাঁমে সিঙ্গা কাড়া টমক নিশানে'।[১৪২]

পদাতিক সেনারা টমকের ধ্বনিতে কলরব করেন –

"পাইকের কলবল ভরিল সিংহল

সিঙ্গা কাড়া টমক নিসান"।[১৪৩]

বিশল্যকরণী থেকে প্রস্তুত ওষুধে সিংহলের মৃত সেনারা বেঁচে উঠেছেন। বেজেছে টমক-

"ঢেমচাঁ টমক সিঙ্গা বাজে জয় ঢোল"।[১৪৪]

নৌকা চলেছে এগিয়ে। বেজেছে টমক-

"বাজত্র টমক সিঙ্গা বায়ুবেগে চলে ডিঙ্গা"।[১৪৫]

বিশেষত পাইকদের নৃত্যের তালে তালে বাজে টমক-

"টমক খমক বেনী বাজে জগঝম্প"।[১৪৬]

সেকালে টমকের বহুল ব্যবহার ছিল। শ্বশুরের কাছ থেকে বিদায় চাইছেন শ্রীমন্ত। মাথায় মুকুট শোভিত দম্পতি বিদায় চাইছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"মৃদঙ্গ মঙ্গল-পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ

টমক খমক বেনী বাজে জগঝম্প"।[১৪৭]

একালের রাজাদের রাজ অভিষেক আর হয় না। আর পদাতিক যোদ্ধারাও গেছে হারিয়ে। একটা যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে টমকও গেছে হারিয়ে।

কিঙ্কিণী:- কিঙ্কিণী হল ছোট ঘন্টা। ঘুঙুর বিশেষ। রমণীদের কোমরে এমন ঘুঙুর থাকে। কবিকঙ্কণের কাব্যে কিঙ্কিণীর উল্লেখ এসেছে। 'বন্দনা' অংশে স্বর্গলোকে কিঙ্কিণীর ধ্বনি শুনিয়েছেন কবিকঙ্কণ-

"মধুর কিঙ্কিণী বাজে   পরিধান পাট সাজে

বচন-গোচর নহে বেশ"।[১৪৮]

কিংবা-

"কনক কিঙ্কিণী হার   দূর করে অন্ধকার

পুরটমুকট মণিদাম"।[১৪৯]

বণিক খন্ডে এমনি স্বর্গ নর্তকী রত্নমালা নেচে চলেছেন। দেবলোকে কিঙ্কিণীর ধ্বনি ওঠে-

"তাতিনি তাতিনি তিনি   মৃদঙ্গ মন্দিরাধ্বনি

ঘন বাজে কিঙ্কিণী কঙ্কণ"।[১৫০]

সেকালে অভিজাত রমণীদের কোমরে থাকত কিঙ্কিণী। বণিক খণ্ডে সওদাগর ধনপতি দত্ত গেছেন বাণিজ্যে। লহনা সপত্নী খুল্লনার প্রতি নির্মম অত্যাচার করেছেন। সমস্ত অলংকার খুলে নিয়ে অত্যাচার করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"খুঞ্যা পরাইআ পাট-সাড়ি কৈল দূর
কিঙ্কিণী লইল তার বাজন নুপুর"।[১৫১]

একালে কিশোরী মেয়েরা আর কোমরে ঘুঙুর পরেন না। একালে নৃত্য শিল্পের ধরন বদলেছে। সাহিত্যের পাতা ছাড়া রত্নমালার নাচকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অন্যান্য লোকবাদ্য : -

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অন্যান্য লোকবাদ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পড়া (পটহ বা ঢাক জাতীয় লোকবাদ্য), ঢাক (পৃঃ৮৭, পৃঃ২৬৪), উরমাল (ঘুঙুর, নূপুর, হাতি বা ঘোড়ার বাদ্য বিশেষ যা যুদ্ধের সময়ে বাজে, পৃঃ৮৯), মাদল (পৃঃ২৬৯), রায়বেনি (পৃঃ২৭১, যুদ্ধরত পদাতিক সৈনিকদের বাঁশি), গজবেনি (গজে আরোহণকারী যোদ্ধার বাঁশি, পৃঃ২৭১), কংষ করতাল (কাঁসার করতাল, পৃঃ২৭১), তবল (পৃঃ২৭১, দুইবার উল্লিখিত), ব্যালিষ (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ,পৃঃ২৭১), ঢেমচাঁ (বাদ্য বিশেষ, পৃঃ৪৪– দুইবার উল্লিখিত, পৃঃ২৮১), দড়মসা (বাদ্য বিশেষ, পৃঃ২৭১), বেণু (পৃঃ২, পৃঃ২০), করতাল (পৃঃ২১১), করতাল (পৃঃ২৭১), বিরকালি (পৃঃ২০৭, বাদ্যযন্ত্র বিশেষ), মোহরি (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, পৃঃ২০৭, পৃঃ২১১), দোসরি (পৃঃ২০৭, বাদ্যযন্ত্র বিশেষ), শৃঙ্গ শঙ্খ (পৃঃ২১১), বেত্রবেণু (পৃঃ২২০), ডুবা (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র, যা বাজিয়ে খেলা দেখানো হয়, পৃঃ২২২)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][১৫২]

মধ্যযুগে যুদ্ধবাদ্যের পরিচয় দিয়েছেন কবিকঙ্কণ নিম্নলিখিতভাবে–

"রায়বেনি গজবেনি বাজে রুদ্রবীণা
দগড় দগড়ি বাএ শত শত জনা।
হাথির গলায় ঘণ্টা বাজে শুনি ঠনঠনি
কংষ করতাল বাজে বিপরীত ধ্বনি।
জয়ঢাক বীরঢাক ব্যালিষ বাজনা
প্রলয়সমএ জেন পড়িছে ঝঞঝনা।
হাতে দামা কাড়া ঢোল তবল নিসান

দামা দড়মসা বাজে বাদ্য সিন্ধুআন"।[১৫৩]

কত বিচিত্র যুদ্ধবাদ্য যে কবিকঙ্কণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার অন্বেষণ করা কঠিন। একটি সময়কে তিনি সাহিত্যের পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সময়ের ব্যবহৃত লোকবাদ্যকে তথ্যনিষ্ঠভাবে উল্লেখ করেছেন কবি। বাংলার লোকবাদ্য সামাজিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। উৎসব-অনুষ্ঠান, বিবাহ, পূজা-পার্বণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লোকবাদ্যের ব্যবহার ছিল। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রাচীনকালে শয়নকক্ষে নানা বাদ্যযন্ত্র শোভা পেত। শয়নকক্ষের বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে বীণা প্রধান। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের শয়নকক্ষে যে সব বাদ্যযন্ত্র রাখা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীণা, ডমরু, পটহ(ঢাক জাতীয় লোকবাদ্য), মৃদঙ্গ, পণব (বাদ্য বিশেষ, পাখোয়াজ), ডিণ্ডিম, আড়ম্বর (বাদ্য বিশেষ), মুরজ প্রভৃতি। রমণীদের একান্ত সঙ্গী ছিল এসব লোকবাদ্য।

বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডে কবি লিখেছেন-

"মুরজেষু মৃদঙ্গেষু চেলিকাষু চ সংস্থিতা
তথাস্তরণমুখ্যেষু সংবিষ্টাশ্চাপরাঃ স্ত্রিয়ঃ"।[১৫৪]

বাংলার লোকবাদ্য ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল লোকসঙ্গীত। কীর্তন প্রভৃতি বাংলার সঙ্গীতের নানা ক্ষেত্রে লোকবাদ্যের ব্যবহার হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'Folklore Of Bengal'গ্রন্থে লিখেছেন- "Folk songs befitting the occasion are sung by the women accompanied by music played by drum (dhol), a bell – metal plate (kansi) and a pipe instrument (shehnai)."[১৫৫]

তথ্যসূচীঃ

১. Mookerjee, Ajit, Folk art of India, India Library, Clarion Books, New Delhi , 1986, Introduction, p. –14

১ (ক). ওয়াহাব, আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.১৭৬

২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃঃ ২

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০

৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২২

৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭১

৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৪

৭. তদেব

৭ (ক).ওয়াহাব, আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.১৭৫

৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩

৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৭

১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৯

১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ২১৩

১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৫

১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২২৯

১৪. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, মেঘনাদবধ কাব্য : সপ্তম সর্গ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পাদক– সব্যসাচী রায়, কামিনী প্রকাশালয়, ১৩৯৯, পৃঃ১০৭

১৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি. ২০১৩

১৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ২০

১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৫৮

১৭(ক).ওয়াহাব, আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.১৮৯

১৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩

১৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪

২০ পূর্বোক্ত, পৃঃ৯১

২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২৪

২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ২০৭

২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২০৮

২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ২০৮

২৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ২১১

২৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৪

২৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭১

২৮. পূর্বোক্ত

২৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭৫

৩০. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭৬

৩১. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৪

৩২. পূর্বোক্ত

৩৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ), বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র, সম্পাদনা : কাঞ্চন বসু, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ৬৩০

৩৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২২

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২৫

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ২০৭

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৯৯

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০৪

৪০. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০

৪১. পূর্বোক্ত, পৃঃ৯১

৪২. পূর্বোক্ত

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৫

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ২০৭

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ২১

৪৬(ক). ওয়াহাব, আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্যও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৬, পৃঃ ১৭৭

৪৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃঃ ৫২

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ১১০

৪৯. পূর্বোক্ত

৫০. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৭

৫১. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭৪

৫২. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২২

৫৩. পূর্বোক্ত

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৫

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৯

৫৭. পূর্বোক্ত

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৩

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ২১১

৬০. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৫৮

৬১. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭৪

৬২. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০১

৬৩. বাল্মীকি, শ্রী মন্মহর্ষি, রামায়ণম্: সুন্দরাকাণ্ড, সম্পাদক- শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে ২০১২, পৃঃ৭৩৬

৬৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ৯১

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬১

৭০. বাল্মীকি, শ্রীমন্মহর্ষি, রামায়ণম্, সম্পাদক- শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে ২০১২, পৃঃ ৭৩৬

৭১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চন্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অ্যাকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩

৭২. পূর্বোক্ত, পৃঃ২

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২০

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৭

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭৪

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৭

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭১

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৭

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৭

৮০. পূর্বোক্ত, পৃঃ৯১

৮০(ক). ওয়াহাব, আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.১৫৮

৮০(খ). পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৩

৮১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩

৮২. পূর্বোক্ত, পৃঃ২

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২০

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৭

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮২

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ১১০

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২৫

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৭

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ২১১

৯০. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০৪

৯১. বাল্মীকি, শ্রী মন্মহর্ষি, রামায়ণম (সুন্দরাকান্ড, একাদশ সর্গ), সম্পাদক- শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে-২০১২, পৃঃ৭৩৬

৯২. Chevalier, Jean, Alain, Gheerbrant, Dictionary of Symbols, Penguin Books, 1996, Conch, P. - 228

৯৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ২০

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮০

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৭

৯৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ১১২

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২২

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২৩

১০০. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২৪

১০১. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪৭

১০২. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭৩

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭৪

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৪

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৭

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৮

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩২

১০৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৫৪

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০০

১১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০৩

১১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০৪

১১২. পূর্বোক্ত

১১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ৪৮

১১৪. পূর্বোক্ত

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৮

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৯

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭১

১১৮. পূর্বোক্ত

১১৮(ক). ওয়াহাব, আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.১৮৭

১১৯. বাল্মীকি, শ্রীমন্মহর্ষি, রামায়ণম (সুন্দরা কান্ড), সম্পাদক- শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে ২০১২, পৃঃ৭৩৬

১২০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃঃ৮৮

১২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৯

১২২. পূর্বোক্ত

১২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২১১

১২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৮১

১২৪(ক). ওয়াহাব, আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.১৬৯

১২৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০

১২৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৮

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ৮৮

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ৯৩

১৩০. Shanti, Swarup, 5000 Years of Arts and Crafts in India and Pakistan, Bombay, 1968, P. 212, Behind Product – Chandra Shekher Shaha, Masrur Mamun Mithu- এর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। Design and Technology Centre, Dhaka– 1213, December – 2004, P.- 47

১৩০(ক). ওয়াহাব, আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.২০৭

১৩১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃঃ১২২

১৩২. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২৫

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২০৭

১৩৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৫

১৩৫. পূর্বোক্ত

১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ১১০

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২২

১৩৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ১২৫

১৩৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৫৩

১৪০. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯৩

১৪১. পূর্বোক্ত, পৃঃ২১১

১৪২. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৩১

১৪৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৫২

১৪৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৮১

১৪৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৯৮

১৪৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০১

১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০৪

১৪৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ৬

১৪৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ৬

১৫০. পূর্বোক্ত, পৃঃ১১০

১৫১. পূর্বোক্ত, পৃঃ১৩৮

১৫২. পূর্বোক্ত

১৫৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭১

১৫৪. বাল্মীকি, শ্রীমন্মহর্ষি, রামায়ণম: সুন্দরাকাণ্ড, একাদশ সর্গ।।৬।।, সম্পাদক- শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে ২০১২, পৃঃ৭৩৬

১৫৫. Bhattacharya, Ashutosh, Folklore of Bengal, National Book Trust, New Delhi, 2007, PP. 74,75